ক্যালকুলাসের ভারতীয় আত্মীয়

বি মা ন না থ

ক্যালকুলাসের জন্ম ভারতে! সত্যি নাকি? আসলে, আমাদের কৃতী পূর্বপুরুষরা কতদূর কী জানতেন সে সম্পর্কে আমরা নিজেরা খুব কম জানি। ফলে তর্ক পরিণত হয় বচসায়।

প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কী কী আবিষ্কার করেছিলেন তা নিয়ে মাঝে মাঝেই জল ঘোলা হয়। আমরা যারা ইতিহাসবিদ নই, এই সব ব্যাপারে তাঁদের অনেকের ধারণা খুব ঝাপসা। আমরা আর্যভট, বরাহমিহির এঁদের নাম শুনেছি, কিন্তু তাঁরা ঠিক কী করেছিলেন সেই সম্বন্ধে খুব একটা ওয়াকিবহাল নই। স্কুলের পাঠ্যবইয়ে শূন্যের আবিষ্কার নিয়ে বলা হয়। কিন্তু এই কথাটার তাৎপর্য যে কী, সেটা পরিষ্কার ভাবে বলা হয় না। ধাতুবিজ্ঞান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে দিল্লির লৌহস্তম্ভের ছবি দেখানো হয়, কিন্তু ইস্পাত তৈরি সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে ঠিক কী জানতেন আর কী জানতেন না, তা খোলসা করে বলা হয় না। তাই প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের ধারণাগুলো ভাসা ভাসা। আর সেই জন্য এই বিষয় নিয়ে কোনও আলোচনা বা তর্ক সাধারণত বচসায় পর্যবসিত হয়। এক দল বলেন 'সব ব্যাদে আছে', আর অন্য দল বিশ্বাস করেন যে ইংরেজরা আসার আগে ভারতীয়রা ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বিজ্ঞানের কিছুই জানত না। বর্তমানে এই প্রশ্নের সঙ্গে রাজনীতির ছোঁয়া লেগেছে। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু জানতেন বলতে গেলে হিন্দুত্ববাদী-র তক্‌মা লাগতে পারে। আর সমালোচনা করতে গেলে নিজের ঐতিহ্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীন, এমন উল্টো অপবাদ শুনতে হতে পারে।

সম্প্রতি একটা সূত্রের দাবি শোনা যাচ্ছে, ক্যালকুলাস ভারতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। আমরা সাধারণত জানি যে ক্যালকুলাস, বা কলনবিদ্যা, আবিষ্কার করেছিলেন নিউটন এবং লাইবনিৎস। সপ্তদশ শতাব্দর এই আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। আজ যদি এটা সত্য প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নিউটন-লাইবনিৎস-এর ঢের আগেই ক্যালকুলাস-এর রহস্য আয়ত্ত করেছিলেন, তাহলে বিজ্ঞানের ইতিহাসে কিছু নতুন প্রশ্ন জন্ম নিতে পারে। এই নিয়ে সাধারণ স্তরে অবশ্য কোনও তর্ক বা আলোচনা হচ্ছে না, কেবল বিশেষজ্ঞরাই এ নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু সেই কথাগুলো সাধারণ লোকজনের সামনে তুলে ধরা হয়নি। কারণটাও সেই

একই— ভয়: কেউ কিছু মনে করতে পারে, বা মিথ্যে অপবাদ শুনতে হতে পারে।

আর-একটা কারণ হল এই প্রশ্নের উত্তর খুব সম্ভবত হ্যাঁ আর না-এর মাঝামাঝি। মনে হতে পারে এটা একটা ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতন উত্তর হল। আসলে ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে ক্যালকুলাস-এর পর্ব যতটা চমকপ্রদ ততটাই জটিল। খোলসা করে না বললে উত্তরটা হেঁয়ালি মনে হবে।

ক্যালকুলাস ব্যাপারটা কী? তা খায়, না মাথায় দেয়? ক্যালকুলাসের সাহায্যে আমরা প্রথমত কোনও কিছুর পরিবর্তনের হার জানতে পারি। শেয়ার বাজারের ওঠানামার উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক আমরা কোনও এক মাসের প্রতিদিন কী ভাবে শেয়ার বাজারের ইনডেক্স বা সূচক কমবেশি হয়েছে সেই খবর জানি। তাহলে আমরা মাসের প্রথম আর শেষের দিনের ইনডেক্সের পার্থক্য থেকে পুরো মাস জুড়ে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে তার একটা গড় হার বার করতে পারি। কিন্তু শেয়ার বাজার তো আর কোনও সহজ নিয়মের গোলাম নয় যে একই ভাবে কমবে বা বাড়বে! তাই পরিবর্তনের গড় হারের চেয়ে শেয়ার বাজার কী ভাবে ওঠানামা করেছে, অর্থাৎ গড় পরিবর্তনের চেয়ে সূক্ষ্ম সময়ের ব্যবধানে কেমন করে কমবেশি হয়েছে সেই খবরটা আরও দরকারি হতে পারে।

আর-একটা উদাহরণ স্বরূপ পৃথিবীর চারিদিকে কোনও একটা কৃত্রিম উপগ্রহের ঘোরার কথা ধরা যাক। যেহেতু তার কক্ষপথ উপবৃত্তাকার, তাই তার গতিবেগ কক্ষপথের এক-এক জায়গায় এক-এক রকম হবে। যখন সেটা পৃথিবীর কাছে চলে আসে তখন তার গতিবেগ বেশি, দূরে গেলে কম। এই সতত পরিবর্তনশীল গতিবেগের জন্য কীভাবে তার স্থান পরিবর্তন হচ্ছে, বা উল্টো করে দেখতে গেলে, কী ভাবে তার কক্ষপথ জানা থাকলে প্রতি মুহূর্তে তার গতিবেগ বার করা যেতে পারে, এই ধরনের অঙ্কে ক্যালকুলাস-এর প্রয়োজন হয়। পরিবর্তনের গড় হার নয়, কোনও কিছুর তাৎক্ষণিক পরিবর্তনের হার জানার জন্য ক্যালকুলাসের দরকার।

পরিবর্তনের হার নিয়ে প্রাচীন ভারতে সত্যিই ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল। নিউটনের এক হাজার বছর আগেই, প্রায় পাঁচশো খ্রিস্টাব্দে স্বয়ং আর্যভট্ট এই ধরনের চিন্তার একটা আভাস দিয়েছিলেন। সেই কথায় যাবার আগে একটা মজার গল্প বলে নেওয়া যাক। সাইন, কোসাইন ইত্যাদি গণিত-ঘেঁষা শব্দ সাধারণের কাছে অপরিচিত, কিন্তু ত্রিকোণমিতির সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাতেই এরা এসে হাজির হয়। যে-কোনও কোণের সাপেক্ষে কয়েকটা আনুপাতিক মাপজোখ চিহ্নিত করে এরা। একটা বৃত্ত সম্বন্ধে বলতে গেলে যেমন ব্যাস, ব্যাসার্ধ, জ্যা এরকম শব্দ আসে, সাইন, কোসাইন এগুলোর কথা আসে কোনও কোণের সাপেক্ষে।

যা হোক, এই শব্দগুলোর পিছনে আছে একটা মারাত্মক ভুল। ভুল অনুবাদের পরিণাম কোথায় যেতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত সেটা। ক্যালকুলাস-এর ইতিহাসে এই ভ্রান্তিবিলাসের গল্পটা অবশ্য একেবারে অবান্তর নয়। কোনও কোণের 'সাইন'-এর পরিমাণ বার করার একটা উপায় এরকম: যে কোণের সাইন হিসেব করার চেষ্টা হচ্ছে তার দ্বিগুণ মাপের একটা কোণ আঁকা হল (পৃষ্ঠা ৩৭-এর ছবি দেখুন)। কৌণিক বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে এবার এমন একটা বৃত্ত আঁকা হল, যার ব্যাসার্ধ ১, মাপকাঠি যাই হোক— ইঞ্চি ফুট সেন্টিমিটার যা খুশি। দ্বিগুণ মাপের কোণের বাহু দুটো তাহলে বৃত্তের পরিধির ওপর দুটো বিন্দু কেটে বেরিয়ে যাবে। এই বিন্দু দুটোর মধ্যবর্তী দূরত্বটাকে অর্ধেক করলেই আমরা পেয়ে যাব মূল কোণটার সাইন।

এত আঁকজোক, জ্যামিতিক কসরত দেখে পাঠকদের অনেকে বোধহয় এই অবধি এসে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, আর এগোবেন কি না এই ভেবে। তাহলে আশ্বাস দিয়ে জানাই যে, এই প্রবন্ধের মূল কথাটি বোঝার জন্য কোনও অঙ্ক বা সংজ্ঞার দরকার হবে না। এমনকী সাইন কী তা না জানলেও চলবে, কিন্তু যে-গল্পটা বলতে চলেছি তাতে সাইনের একটা ভূমিকা আছে। আর এভাবে মাপজোখের ব্যাপারটাও একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়, কারণ আর্যভট্টই এটি প্রথম এভাবে দেখিয়েছিলেন।

তখনকার দিনে সৌরমণ্ডলের কক্ষপথ নিয়ে অঙ্ক কষতে বিভিন্ন মাপের কোণ-এর সাইন-এর মান জানতে হত। কয়েকটা বিশেষ কোণ-এর সাইন-এর মাপ সবার জানা ছিল, কিন্তু হুট করে কোনও একটা কোণ দিলে তার সাইন-এর মাপ বার করা সহজ নয়। এর জন্য আর্যভট একটা সারণী বার করেছিলেন, যাতে ০ থেকে ৯০ ডিগ্রির মধ্যে চব্বিশটা কোণের (অর্থাৎ পৌনে চার ডিগ্রির ব্যবধানে) সাইন-এর মাপ ছিল। শ্লোক-এর মধ্যে সংখ্যার সারণী লেখার জন্য তাঁর একটা সংকেত ছিল, যেটা তাঁর 'আর্যভটিয়া' বইয়ের প্রথমেই উল্লেখ করা আছে। তাঁর আগে কেউ এমন সারণি তৈরি করেনি। দেশবিদেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁর সারণি ব্যবহার করে কোনও কোণের সাইন অথবা আর্যভট্টের ভাষায় 'জ্যা' বার করতেন। যখন আরবীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁর সারণিটা অনুবাদ করলেন, তখন 'জ্যা' শব্দটাকে কোনও কারণে 'জিব' বলে লেখা হয়েছিল। তার অনেক পরে দ্বাদশ শতাব্দিতে যখন ক্রেমোনা-র জেরার্ড এই শব্দের ল্যাটিন অনুবাদ করেন, তখন তিনি ভুল করে মনে করেছিলেন যে আরবি শব্দটা হয়তো 'জেব', আরবিতে যার অর্থ হল একটা ভাঁজওয়ালা গর্ত, বা সহজ ভাষায়, একটা পকেট বিশেষ। তিনি তাই 'জেব'-এর ল্যাটিন অনুবাদ করলেন 'সাইনাস', যার অর্থ কোনও 'বাঁক' বা 'ভাঁজ'-এর ফলে তৈরি একটা গর্ত। এর থেকেই এসেছে 'সাইন'। আর আর্যভট্টের 'কটি-জ্যা'র জায়গায় এসেছে কোসাইন। আমরা যখন সাইনাস-এর জন্য মাথাব্যথার কথা বলি, তখন নাকের ভেতরকার ভাঁজ-এ জমে থাকা শ্লেষ্মার জন্য ব্যথার কথা বলি। সেই একই সাইনাস-এর কথাই এখন ত্রিকোণমিতিতে একটা ভুল অনুবাদের সৌজন্যে ঢুকে পড়েছে। কে জানে ভবিষ্যতের ছাত্রছাত্রীদের ত্রিকোণমিতির অঙ্ক দেখে মাথাব্যথার কথা মনে করেই কি না।

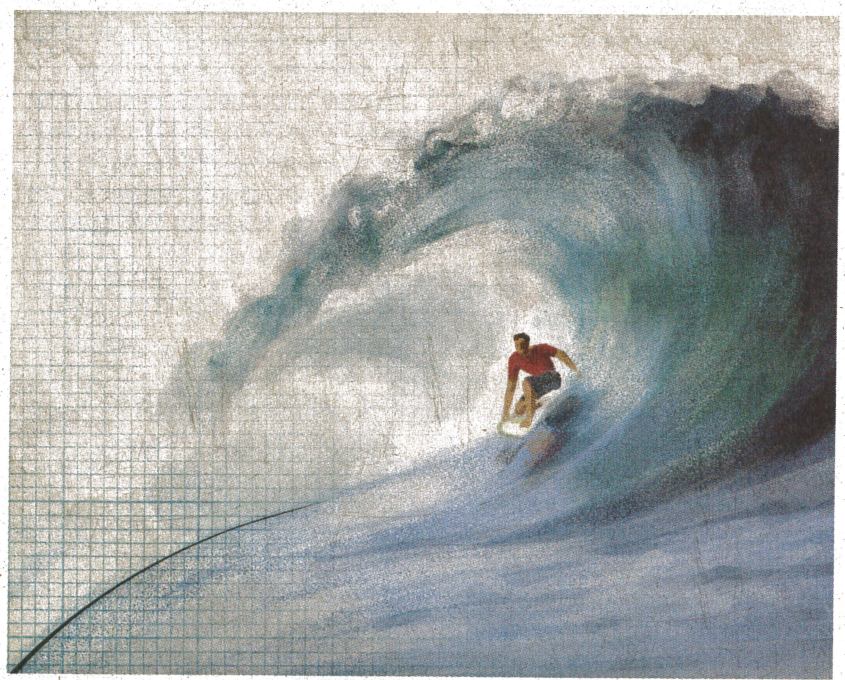

যাই হোক এই গল্প থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আর্যভট্টের সাইন-সারণি তখনকার দিনে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর্যভট্ট কিন্তু এমন একটা রেফারেন্স সারণি তৈরি করেই কাজ সারেননি। এই তুখোড় গণিতবিদ তাঁর তালিকায় একটা মজার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখলেন, পরপর দুই কোণের সাইন-এর তফাতের মধ্যে একটা নিয়ম রয়েছে। ধরা যাক একটা তালিকায় প্রথমে ২ ডিগ্রি, ৩ ডিগ্রি, ৪ ডিগ্রি ইত্যাদি কোণের সাইন-এর পরিমাপ দেওয়া আছে। আর্যভট্ট পরপর দুই কোণের সাইনের তফাত বার করলেন, যেমন ৩ ডিগ্রি আর ২ ডিগ্রির সাইনের মধ্যে ফারাক। এরপর আর একটা সারিতে বার করলেন পরপর দুই জোড়া কোণের সাইন-এর তফাতের মধ্যে বেশিকম। অর্থাৎ ৩ ডিগ্রি আর ২ ডিগ্রির সাইনের মধ্যে যতটুকু তফাত, আর ৪ ডিগ্রি এবং ৩ ডিগ্রির সাইনের মধ্যে যা তফাত, এই দুইয়ের মধ্যে কম-বেশি কতটুকু।

তিনি লক্ষ করলেন যে, এই দ্বিতীয় পর্যায়ের তফাতটা কোণগুলোর সাইন-এর পরিমাপ-এর সমানুপাতিক। অর্থাৎ, প্রথমে তিনি কোণগুলোর সাইন-এর পরিবর্তনের হার বার করলেন। এই হারটাও কোণ-এর পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে। তার মানে সাইন-এর মান যে-হারে বাড়ে, তার পরিবর্তনেরও একটা হার আছে। আর্যভট্টের অঙ্ক অনুযায়ী এই দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিবর্তনের হার হল সাইনের সমানুপাতিক। আজকের যুগের ছাত্রেরা এই অঙ্কটাকে ক্যালকুলাস-এর ভাষায় বললে সহজে চিনতে পারবে। আমরা বলি যে সাইন-এর দ্বিতীয় 'ডেরিভেটিভ' হল সাইনের সমানুপাতিক। আমরা এটাকে আধুনিক ক্যালকুলাস-এর একটা ফল বলে জানি। কিন্তু আর্যভট্ট এই কথাটার একটা আভাস পেয়েছিলেন তাঁর সারণী থেকে।

তবে এটুকু জেনেই বলা যায় না যে, আর্যভট্ট ক্যালকুলাস-এর রহস্য বুঝতে পেরেছিলেন। আর্যভট্ট পরপর দুটো কোণ-এর সাইন-এর তফাতের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি এই তফাতকে সাইন-এর 'পরিবর্তনের হার' বলে ভাবেননি। আর এই নিয়ে ভেবে কী লাভ হতে পারে সেটা নিয়েও মাথা ঘামাননি। শেয়ার বাজারের উদাহরণটা আবার নেওয়া যাক। ধরা যাক, জানুয়ারি মাসে তার ইনডেক্সের গড় মান ছিল ২০০০০, তারপর ফেব্রুয়ারিতে গড় হল ২১০০০, আর মার্চে হল গিয়ে ২৩০০০ (এই ভাবে বাড়তে থাকলে অবশ্য পাঠক-পাঠিকারা এই প্রবন্ধ ছেড়ে নতুন শেয়ার কিনতে বেরিয়ে যেতে পারেন।) তখন আমরা ফেব্রুয়ারি আর জানুয়ারির মধ্যে বৃদ্ধির হার পাব প্রতি মাসে ১০০০ করে, আর ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে ২০০০ করে। এই হিসেবগুলো থেকে আন্দাজ মিলবে গত তিন মাসে পরিবর্তনের হারটা কেমন করে বেড়েছে। কিন্তু এটা হবে একটা গড় হার। আমরা যদি জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে যে কোনও একটা দিনের ইনডেক্স বার করতে চাই, ধরুন দশ ফেব্রুয়ারিতে তার মান কত ছিল এটা বার করতে বসি, তাহলে একটা আন্দাজ দেওয়া ছাড়া বেশি কিছু বলতে পারব না। অর্থাৎ, সূক্ষ্মভাবে জানতে গেলে কেবল পরিবর্তনের হারের গড় পরিমাণ নয়, কম সময়ের ব্যবধানে (যেমন প্রতিসপ্তাহে বা প্রতিদিন) সেটা কী ভাবে বেড়েছে বা কমেছে তার খবরও চাই।

ক্যালকুলাস-এর মূল কথাটা এখানেই। যত সূক্ষ্ম ব্যবধানের খবর জানব, তত ভাল করে পরিবর্তনের হার মাপতে পারব আমরা। কতটুকু সূক্ষ্ম ব্যবধান হলে ভাল হয়? ব্যবধানটাকে কমিয়ে একেবারে তো শূন্য করা যাবে না (তাহলে তো কোনও পরিবর্তনই টের পাব না) কিন্তু শূন্য ব্যবধানের যত কাছাকাছি যাওয়া যায়, ততই ভাল। শুধু প্রতিদিন কেন, প্রতিঘণ্টা, বা আরও কম সময়ের মধ্যে শেয়ার মার্কেটের ইনডেক্স-এর খবর জানলেও ভাল। আধুনিক গণিতের ভাষায় আমরা একে কোনও পরিমাপের 'সীমান্ত-মান' বা 'লিমিটিং ভ্যালু' বলি।

আর্যভট্টের একশো বছর পর যখন ব্রহ্মগুপ্ত সাইন-এর সারণি নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন, তখন তিনি পরিবর্তনের হার বার করার জন্য সূক্ষ্ম ব্যবধানে মাপ নেবার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি এও টের পেয়েছিলেন যে, এই সব নিয়ে চিন্তা করে আখেরে কী লাভ। ব্রহ্মগুপ্ত গণিতবিদ হিসেবে ছিলেন প্রবাদপ্রতিম মানুষ। জ্যোতির্বিদ্যার ব্যাপারে অবশ্য তিনি আর্যভট্টের অনেক গবেষণার ফল ভুল বলে নাকচ করে দিয়েছিলেন। যেমন পৃথিবীর নিজের চারদিকে ঘোরার প্রসঙ্গে আর্যভট্টের মতবাদকে ভুল ঘোষণা করেছিলেন, বলেছিলেন যে পৃথিবী 'অচল'। সেই সব ক্ষেত্রে অবশ্য ব্রহ্মগুপ্তর মতামতটাই এখন অচল। কিন্তু গণিতের ব্যাপারে ব্রহ্মগুপ্তের জুড়ি ছিল না। শূন্য নিয়ে চিন্তা করার প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর, তাঁর জীবনের শেষের দিকে, তিনি আর্যভট্টের সারণিকে আর-এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবার একটা উপায় ঠাওরালেন।

> কে প্রথমে কী করেছিল, সেটা জানার দরকার আছে বইকি, কিন্তু তা নিয়ে বাগবিতণ্ডা না করে আমরা যদি আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, মাধব, এঁদের সত্যিকারের অবদানের কথা ভাবি, তাহলেই রোমাঞ্চিত হতে হয়।

(এখানে বলে রাখা ভাল যে কয়েকজন ইতিহাসবিদ মনে করেন, ব্রহ্মগুপ্ত শূন্য নিয়ে কাজ করার আগেই এই গবেষণা করেছিলেন। এই নিয়ে মতানৈক্য আছে।)

ধরা যাক কেউ আমাদের শেয়ার মার্কেটের পরিবর্তনের হার বলে দিল, এবং সেই পরিবর্তনের ওঠানামার হারও জানিয়ে দিল। তাহলে আমরা সহজে কোনও নির্দিষ্ট দিনের ইনডেক্স থেকে তার কাছাকাছি অন্য কোনও দিনের ইনডেক্সটাও বার করতে পারব। অর্থাৎ যে সব দিনের ইনডেক্স-এর মান আমাদের হয়তো জানা নেই, সেই সব দিনের খবরও বার করতে পারব। অনেকটা এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফ দেবার মতন। আধুনিক গণিতের ভাষায় এই পদ্ধতিকে আমরা ইন্টারপোলেশন (বা অন্তর্বেশন) বলি। কিন্তু লাফ দেবার জন্য গাছদুটোর মধ্যে ব্যবধান কম হওয়া চাই। এক গাছ থেকে অন্য গাছের দূরত্ব বেশি হলে লাফ দিতে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙা দ' হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ধরা যাক প্রতিমাসের প্রথমে শেয়ার মার্কেটের ইনডেক্স কত সেই তথ্য আমাদের জানা আছে। তখন দশ ফেব্রুয়ারির ইনডেক্স কত ছিল এই অঙ্ক করতে গিয়ে আমরা ফেব্রুয়ারির প্রথমে কত ছিল সেই খবর, আর সেই সময় পরিবর্তনের হার কেমন ছিল, সেই তথ্য ব্যবহার করব। তখন জানুয়ারি বা মার্চের তথ্য ব্যবহার করলে খুব দূরে লাফ দেওয়া হবে, অঙ্কের ফল ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

ব্রহ্মগুপ্ত ঠিক তেমনই ভেবেছিলেন যে, কোনও একটা কোণের সাইন-এর মাপ ব্যবহার করে এবং সাইনের পরিবর্তনের হার ব্যবহার করে কাছাকাছি আর-একটা কোণের সাইন বার করা যেতে পারে। এই গণনার জন্য সাইনের পরিবর্তনের হার, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিবর্তনের হার কী ভাবে ব্যবহার করতে হবে, তার একটা ফরমুলাও দিয়ে গিয়েছিলেন ব্রহ্মগুপ্ত। সেটা একেবারে নির্ভুল। শুধু তাই নয়, গণিতের ইতিহাসে ইন্টারপোলেশন-এর জন্য এই রকম দ্বিপদ ফরমুলা ব্রহ্মগুপ্তই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। এই অঙ্কে ক্যালকুলাসের একটা আঁচ আছে বটে, কিন্তু তার বেশি নয়। ব্রহ্মগুপ্ত এই অঙ্ক জ্যামিতির নিয়ম মেনে আবিষ্কার করেছিলেন।

ব্রহ্মগুপ্তের কয়েক শতাব্দি পরে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য (যাঁর জন্মের প্রায় এক হাজার বছর পেরিয়ে গেছে) এই অঙ্ককে আর-এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর লেখায় প্রথম লক্ষ করা যায় যে, তিনি তাৎক্ষণিক পরিবর্তনের হারের কথা ভাবছিলেন। তাঁর শ্লোকে আকাশের গ্রহের 'তৎকালিক' গতি নির্ধারণ করার পদ্ধতি দেওয়া রয়েছে। এমনকী এই তৎকালিক গতির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান বার করার কথাও আছে। এই শ্লোকগুলোর মূল বক্তব্যের সঙ্গে আধুনিক ক্যালকুলাসের ভাষার অদ্ভুত মিল। তবে

ভাস্করাচার্য কীভাবে এইসব উপপাদ্য প্রমাণ করেছিলেন তার কোনও উল্লেখ নেই।

ব্রহ্মগুপ্ত-ভাস্করাচার্যের পর কয়েক শতাব্দি ধরে ভারতে গণিত নিয়ে বিশেষ কোনও গবেষণা হয়নি। হয়তো সেই সময়ে আর্যাবর্তে এইসব গবেষণা করার মতো অবস্থা ছিল না। এর তিনশো বছর পর দক্ষিণ ভারতে আবার গণিতের গবেষণার পুনরাবির্ভাব হয়। সেখানকার গণিতবিদরা ব্রহ্মগুপ্তের পদ্ধতি নিয়ে ভাবতে শুরু করে দেখলেন যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের কম-বেশিটাও কোণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা বাড়ছে-কমছে। অর্থাৎ এরও একটা পরিবর্তনের হার আছে। যেটাকে তৃতীয় পর্যায়ের পরিবর্তনের হার বলা যেতে পারে। তাঁরা একেও ব্রহ্মগুপ্তের ফরমুলার শেষে আর-একটা পদ হিসেবে যোগ করলেন। এমন করে দেখতে গেলে এই ফরমুলাটার আসলে কোনও শেষ নেই। সেখানে একের পর এক বিভিন্ন পর্যায়ের পরিবর্তনের হার চলে আসবে, যদিও তাদের মাত্রা একটু একটু করে কমে আসবে। খুব সূক্ষ্ম অঙ্ক কষতে গেলেই সেই সব বিভিন্ন পর্যায়ের পরিবর্তনের হার-এর প্রয়োজন পড়বে। অর্থাৎ একে একটা ফরমুলা না বলে একটা সিরিজ বা ক্রম বলা যেতে পারে। এই নিয়ে চতুর্দশ শতাব্দিতে প্রথম গবেষণা করেন মাধব নামে এক গণিতবিদ। বর্তমান কেরালার ত্রিচুড়ের কাছে তিরিঞ্জালাকুডা বলে একটা জায়গা আছে, যার প্রাচীন কালে নাম ছিল সঙ্গমগ্রাম। সেখানে এই মাধবাচার্য গণিতের গবেষণায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন, এবং পরবর্তীকালে তাঁর কয়েকজন উত্তরসূরি, যেমন নীলকণ্ঠ, এই গবেষণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মাধবাচার্য নিজে কোনও বই লিখে যাননি, কিন্তু নীলকণ্ঠের লেখা 'যুক্তিভাষ্য' বইতে তাঁর গবেষণার কথা জানা যায়। তিনি জ্যামিতির নিয়ম থেকে সাইন-এর এই সিরিজে তৃতীয় পর্যায়ের পরিবর্তনের হার-এর পদটা যোগ করেন। যে কোনও কোণ-এর সাইন-এর মান বার করতে এই সিরিজের তুলনা নেই।

তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে, মাধব বা ব্রহ্মগুপ্ত ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেছিলেন? এর সঠিক উত্তর হবে: না। কিন্তু তাঁরা খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। একটা কথা পরিষ্কার যে, ভারতীয় পণ্ডিতরা শুধু ত্রিকোণমিতির সাইন-কোসাইন-এর পরিবর্তনের হার নিয়েই গবেষণা করেছিলেন। অন্য কোনও ক্ষেত্রে পরিবর্তনের হার নিয়ে ভাবেননি, অন্তত কিছু লিখে যাননি। অন্যদিকে নিউটনের সময় থেকে সাধারণ ক্ষেত্রে পরিবর্তনের হারের তাৎপর্য নিয়ে ভাবা শুরু হয়েছিল।

যখন কোনও কিছুর পরিমাপ কোনও একটা চল রাশি বা ভেরিয়েবল-এর ওপর নির্ভর করে,

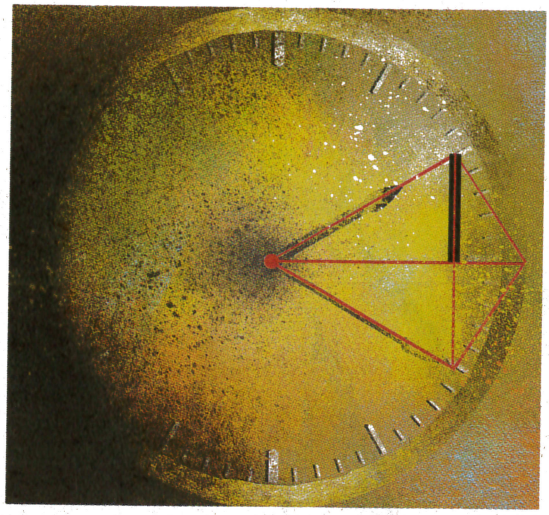

আমরা তাকে একটা 'ফলন' বা 'ফাংশন' বলি। যেমন ধরুন একটা চলন্ত গাড়ি কতটা দূরত্ব পেরল তা নির্ভর করবে সেটা কতক্ষণ ছুটছে তার ওপর। এখানে অতিক্রান্ত সময়টাকে বলা যেতে পারে ভেরিয়েবল, আর অতিক্রান্ত দূরত্ব হল ফলন। সাইন-ও এক ধরনের ফলন, কারণ তার মান নির্ভর করবে কোণটা কত বড় তার ওপর। আধুনিক ক্যালকুলাস-এ যে কোনও ফাংশন-এর মান, তার পরিবর্তনের হার, এমনকী দ্বিতীয় বা অন্যান্য পর্যায়ের পরিবর্তনের হার নিয়ে অঙ্ক করার পদ্ধতি বার করা হয়েছে। তাই মাধব বা ব্রহ্মগুপ্ত ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেছিলেন এই কথাটা সত্যি নয়। তবে এটা মানতেই হয় যে তাঁরা সেই পথে এগোচ্ছিলেন, এবং নিঃসন্দেহে কয়েকটা বড় পদক্ষেপও নিয়েছিলেন। এটুকুই আক্ষেপ থেকে যায় যে তাঁদের উত্তরসূরিরা এই নিয়ে আরও গবেষণা করেননি। করলে ভারতীয় গণিতবিদ্যা আরও উর্বর হতে পারত, তার বদলে তা শতাব্দির পর শতাব্দি একই জায়গায় সীমিত থেকে যায়। হয়তো তার একটা বড় কারণ এই যে, ভারতে শুধু ত্রিকোণমিতির ক্ষেত্রেই এই গবেষণা হয়েছিল। যদি এই গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে সাধারণ ফাংশন-এর পরিবর্তনের হার-এর কথা ভাবা হত, তাহলে হয়তো নিউটনের আগেই এদেশে ক্যালকুলাস চলে আসত।

কয়েকজন অবশ্য অন্য একটা সম্ভাবনার কথা তুলেছেন। এমনও তো হতে পারে যে, মাধব-এর অঙ্কের কথা কোনওক্রমে ইউরোপে পৌঁছেছিল! হয়তো তাঁর কষা অঙ্কই ক্যালকুলাস নিয়ে চিন্তার অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল সেখানে। মাধব-এর সময় মালাবার উপকূলের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ ছিল। ষোড়শ শতাব্দিতে কোচিনের কাছে কয়েকজন জেসুইট মিশনারি এসেছিলেন বলে জানা যায়। হয়তো তাঁরা সমুদ্রযাত্রার প্রয়োজনে ত্রিকোণমিতিতে অঙ্কগুলোর সঠিক উত্তর নির্ণয়ের সময় ভারতের, বিশেষ করে মাধব-এর অঙ্কের কথা জানতে পারেন। তাঁদের কাছ থেকে পরে ইউরোপিয়ান পণ্ডিতমহলে জানাজানি হয়ে থাকতে পারে।

এমনটা হওয়া অসম্ভব নয়, তবে এর কোনও প্রমাণ নেই। এখন পর্যন্ত মাধব-এর অঙ্কের ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দির কোনও ল্যাটিন অনুবাদ খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর ইউরোপিয়ানদের এই সময়কার কোনও বইয়ে ভারতীয় পদ্ধতির কোনও উল্লেখও পাওয়া যায়নি। অবশ্য এও ঠিক যে সব কিছুর লিখিত প্রমাণ দাবি করাটা অন্যায্য। প্রাচীনকালে হয়তো লিখিত বইয়ের তুলনায় মুখের কথায় বা আলোচনার মাধ্যমেই চিন্তাভাবনার বেশি প্রচার হত। এক্ষেত্রেও হয়তো কেউ মাধবের অঙ্কের কথা কাউকে বলেছিল, তাই হয়তো কোনও লিখিত তথ্য নেই। কিন্তু যদি তাই হয়, এবং এই মতবাদের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলে ইতিহাসবিদরা কী বলবেন? কয়েকজন ইতিহাসবিদ মনে করেন যে এই মতবাদ-এর জন্য আরও প্রমাণ চাই, কারণ ইউরোপে এই সময়কার গবেষণার অগ্রগতি সম্বন্ধে লিখিত তথ্যের অভাব নেই। কিন্তু অনেক ভারতীয় লেখক প্রতিবাদ করেছেন যে শুধু লিখিত প্রমাণ পাওয়া গেল না এই অজুহাতে কি এই মতবাদকে বাদ দেওয়া উচিত হবে? এই সম্ভাবনাটাকে পাত্তা না দেবার মধ্যে কি কোনও গূঢ় অভিসন্ধি আছে?

এই বাদানুবাদের বোধহয় কোনও মীমাংসা সম্ভব নয়। এই পর্যায়ে এসে আমরা তথ্য-প্রমাণ নয়, অনুমান এবং মানসিকতার প্রশ্নে চলে এসেছি। কেউ বলবেন যে, ইউরোপিয়ানরা সব সময়ই ভারতীয়দের হেলার পাত্র হিসেবে দেখিয়ে এসেছে, তাই তারা এমন একটা প্রমাণ চাইছে যা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এটা অন্যায়। আবার অন্যেরা বলবেন যে ইতিহাস-এর ক্ষেত্রে আবেগের কথা না বলে তথ্য-প্রমাণ-এর গণ্ডিতেই থাকা ভাল।

আসলে হয়তো এই প্রশ্নটারই কোনও প্রয়োজন নেই। কে প্রথমে কী করেছিল, সেটা জানার দরকার আছে বইকি, কিন্তু তা নিয়ে বাগবিতণ্ডা না করে আমরা যদি আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, মাধব, এঁদের সত্যিকারের অবদানের কথা ভাবি, তাহলেই রোমাঞ্চিত হতে হয়। এদের কথা কি আমরা কখনও আমাদের ছাত্রছাত্রীদের পরিষ্কার করে বলি বা শেখাই? তাঁদের যথাযথ প্রণাম না জানিয়েই আমরা প্রমাণ করতে বসি ভারতীয় ঐতিহ্য কত মহান। আমরা যদি আমাদের ঐতিহ্যের কথা আবেগবর্জিত ভাষায় স্মরণ করি, তাহলেই বোধহয় এই অমর গণিতবিদদের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা জানানো হবে।

অঙ্কন: শুভম দে সরকার